সৈনিকের জবানবন্দি

ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী

পুনশ্চ

॥ ভূমিকা ॥

সৈনিক—বীর, সাহসী, মৃত্যুঞ্জয়ী। বীরদর্প পদ সঞ্চার, সঞ্চালনে অমিত বিক্রম, লক্ষ্যে কঠোর দৃঢ়তা—সৈনিকের অপরিমেয় তেজস্বীতার পরিচয়। আমি সৈনিক জীবনে প্রবেশ না করলে বিশ্ব-সংসারে এই জগৎ আমার কাছে অপরিজ্ঞাতই থেকে যেত।

'সৈনিকের জবানবন্দি' বইটির উপাদানগুলি রীতিমতো তারিখ দিয়ে আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছি। তারিখগুলিতে বিষয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বই প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৬২-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ইন্দো-পাক প্রথম যুদ্ধে একটি ক্যাটাগরির সৈন্যরা কীভাবে ট্রেনিং নেয়, কীভাবে পোস্টিং পায়, রুটিনে কীভাবে জীবন-যাপন করে, যুদ্ধের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেয় এবং কীভাবে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়—সাল-তারিখ ধরে ধরে প্রতিটি ঘটনা মূর্ত করে তুলেছি। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার প্রাচীরের মধ্যে সদা ব্যস্ত সৈনিক জীবনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা না থাকলে এভাবে লেখা সম্ভব হত না। সামরিক জগতের বিশাল পরিধি। একটি কণামাত্র তুলে আনতে পেরেছি আমি। সামরিক জগৎ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে না হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার তাগিদে প্রয়োজন মতো সেখানে জীবনকে নতুন করে শুরু করতে হয়। স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, জানা-অজানা বহু রকমের কৌশল শিখতে হয়। আর সে-সব অভ্যাস অনুশীলন করতে প্রভূত যৌবন-শক্তির প্রয়োজন হয়। এখানে অশক্ত-দুর্বল, অসুস্থ লোকের স্থান নেই, স্থান হয় না। কারণ সেভাবেই বহু ঝাড়াই-বাছাই করে রিক্রুট করা হয়। আমি যে-দিন নির্বাচিত হয়েছিলাম সেদিন প্রার্থী ছিল প্রায় দুশোজন। তাদের মধ্যে আমি একাই যোগ্য বলে বিবেচিত হই। ট্রেনিং-এর জন্য জব্বলপুর পৌঁছে বুঝেছিলাম, এ রকম কঠোর বাছাইয়ের কেন প্রয়োজন হয়। ট্রেনিং-এ 'রগড়া-পট্টি' সহ্য করতেই প্রভূত যৌবন-শক্তির প্রয়োজন হয়। আমাদেরকে যে 'জওয়ান' বলা হয় তা কেবল কথার কথা নয়—জোয়ানীতে শরীর-মন পরিপুষ্ট থাকে বলেই না জওয়ান। সেখানে নতুন করে চলতে যেমন শেখানো হয়, নতুন করে আদব-কায়দা শেখানো হয়, তেমনি মনের দিক দিয়েও তাকে গড়ে তোলা

হয়—দেশের জন্য সমর্পিত প্রাণ। কেবল হুকুমের অপেক্ষা মাত্র। শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন জিনিসটা কী তা জানতে হলে সৈনিক-জীবন জানতে হবে।

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই সৈনিকের ধর্ম। সংগ্রামী মানসিকতা থাকে তার রক্তে। হোক না নির্দয় দারিদ্র্য, নিষ্ঠুর পরিবেশ, কঠোর বাধা-বিপত্তি—সৈনিক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করেই বিজয়ী হয়। সাধারণ বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে একজন সফল সৈনিক হয়ে ওঠার কাহিনি এ গ্রন্থে তুলে এনেছি। নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে পুস্তকাকারে প্রকাশের বাসনা ছিল দীর্ঘদিনের। সময় এবং সুযোগের সংযোগ ঘটছিল না। অবশেষে কমলকুমার দাসের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং প্রকাশক সন্দীপ নায়কের অকুণ্ঠ উদ্যোগে শেষমেশ বইটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হল।

তাছাড়া আমার সহধর্মিণী, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনির সাহচর্য এবং অনুপ্রেরণা না পেলে আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হত না। সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি।

তারিখ
১৮.০৬. ২০১৯

লেখক
ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী

১১ ডিসেম্বর ১৯৬২ থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৬৩ পর্যন্ত মিলিটারি ট্রেনিং এর জন্য আমি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ছিলাম। ১৭ বছর আর্মি লাইফের উদ্‌বোধন হয়েছিল জবলপুরে। এই জীবনটা কিন্তু সিভিলিয়ানদের মতো সাধারণ সাদা-মাটা জীবন নয়। ভরপুর যৌবনে বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই জীবন। দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্তরের কোনো ব্যাপার নেই সামরিক বিভাগে। সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত এই বিভাগ ভারতের প্রতিটি প্রদেশের কোনা কোনা থেকে আমার মতো বয়সের ছেলেরা এসে এখানে যোগদান করেছে। 'নানা ভাষা, নানা মত' কিন্তু এখানে একই পরিধান, একই প্রশিক্ষণ; একই রকম জীবন-যাপন। নানা বিষয়ে সামরিক শিক্ষার মধ্যেও আমাদের অলক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। প্রত্যেকের পারিবারিক অবস্থা সেই-সব পরিবার থেকে আলাদা আমরা এসেছি—শংকা, আশংকা সব তুচ্ছ করে। কাজেই চল্লিশ জনের সেকসনে আমরা সবাই একে অপরের সমব্যথী। বলতে কী, এত ঠাসবুনন প্রোগ্রাম যে আমাদের মধ্যেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হত। ইন্টার-সেকসান যোগাযোগ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। অথচ এখানে দশ বারোটি সেকসান এক সঙ্গে চলতে পারতো। আমি ছিলাম টু এম্. টি. আরএ (টু মিলিটারি ট্রেনিং রেজিমেন্ট)। এই জবলপুরেই ওয়ান এম্. টি. আর-ও ছিল। তবে সেটি আমাদের থেকে কিছু দূরে। ১৯৬২ থেকে '৬৩ সালে হাজার হাজার জওয়ান রিক্রুট হয়ে এখানে মিলিটারি প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বলা ভালো এরা সবাই আর্মির সিগন্যাল কোরের জন্য। অন্যান্য কোরের জন্য ট্রেনিং অন্যান্য জায়গায় হয়েছে। মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে জওয়ানদের হরেক রকমের ট্রেড দেওয়া হয়েছে। যেমন এম্. টি. ড্রাইভার, ই. এফ. এস, ডিয়ার, লাইনস্ ম্যান, ও. আর. এল, ও. কে. এল, সাইফার, রেডিও ম্যাক, লাইনম্যাক, টেলি ম্যাক ক্ল্যারিকেল ইত্যাদি। এ থেকে ডি পর্যন্ত এইসব ট্রেডের গ্রুপ। আমি বি গ্রুপে ছিলাম। বলতে কী বিশাল পরিকাঠামো না থাকলে স্রেফ একটা কোরেই হাজার হাজার জওয়ানদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে, দেশ-প্রতিরক্ষার কাজে তৈরি রাখা যায় না। হয়তো ১৯৬২ সালে চাইনিজ আক্রমণের প্রেক্ষিতে ভারতও 'প্রতিরক্ষা' জোরদার করতে উদ্যোগী হয়। আর তারই ফল, জবলপুরে এই সময়ে ব্যাপক হারে সামরিক প্রশিক্ষণ।

৬. ১২. ১৯৬২ ॥

রিক্রুটিং অফিস বহরমপুরে নির্বাচন। ভোরে ঘুম থেকে জেগেই লিখছি। বহরমপুর থেকে কাল রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় ফিরেছি। খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম। খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। কাল আর লেখা হয়নি; আজ লিখছি।

জীবনের পট পরিবর্তন অস্বাভাবিকভাবে ঘটে গেল। বহরমপুরে আমরা তিনজন ফুলিয়া থেকে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। একমাত্র আমি ছাড়া পরীক্ষায় আর কেউ পাশ করেনি। যতক্ষণ না-হয়েছে ততক্ষণ 'হলেই হত' 'হলেই হত'—মনে হয়েছে। কিন্তু যখন হয়ে গেছে তখন মন বলছে এতটা তো আশা করিনি। কিন্তু আশা যা-ই করে থাকি একথা অবধারিতরূপে সত্য যে আর্মিতে আমায় যেতেই হবে।

শুধু আন্ডার ওয়ার পরে বহরমপুর রিক্রুটিং অফিসে বেলা বারোটায় আমরা সর্বমোট আটজন দাঁড়ালাম। সাধারণ ফিটনেস অর্থাৎ ওজন, লম্বা, বুকের ছাতি (সাধারণ ও সম্প্রসারণ অবস্থায়) পরিমাপ এবং পায়ের সাধারণ অবস্থা এইগুলির মোটামুটি পরীক্ষায় আমরা তিনজন টিকলাম। তার মধ্যে একজন ওভার এজের দরুণ বাদ পড়ল। আর একটি ছেলে নেকেট অবস্থায় দাদ (স্কিন ডিজিজ) ধরা পড়ায় সিলেক্ট হয়নি। এবার শেষ পর্যন্ত থাকলাম আমি। চক্ষু পরীক্ষা শেষ হল। তাতে আমার কোনো ডিফেক্ট ধরা পড়েনি। অতঃপর ইলেকট্রিক লাইট জ্বালানো দরজা-জানালা বন্ধ একটি প্রশস্ত ঘরে যে সামান্য আন্ডারওয়ারটুকু পরনে ছিল রিক্রুটিং অফিসারের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত খুলে ফেলতে হল। তারপর দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই অফিসার ও তার সহকারীর নির্দেশ মতো নাড়িয়ে-চাড়িয়ে লাফিয়ে, শুয়ে, বসে, ঘুরে ফিরে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে শরীরের নিখুঁত প্রমাণ দিতে হল। সেথায়ও আটকায়নি। টিকে গেলাম। পরে আন্ডারওয়ার পরে বোর্ডের সামনে গেলাম। সেখানে আরও একজন আর্মির অফিসার ছিলেন। রিক্রুটিং অফিসারই জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে যাবে?' প্রশ্ন করলাম, কোথায় আমাকে যেতে হবে?' উত্তর করলেন, 'ব্যাঙ্গালোর।' বুঝলাম, সিলেক্ট হয়ে গেছি। বললাম, দিন ছয়েক সময় দিলে ভালো হত।' অফিসার বললেন, 'এত সময় দিয়ে কী করবে? তাহলে আর কী হল?' অফিসারের কথায় একটু নৈরাশ্যের ভাব। আমি কয়েক সেকেন্ড ভাবলাম। পরে বললাম, ঠিক আছে, কালই আমি যেতে রাজি।' তিনি বললেন, 'কাল নয়, ৯ তারিখ অর্থাৎ এই আসছে রোববার দিন একটা ছোট্ট বেডিং, ট্রেনে থাকার মতো আর এক সেট জামা প্যান্ট, পার তো গোটা কয়েক টাকা নিয়ে এখানে হাজির হবে। আর কানটা একটু পরিষ্কার করে এসো। এটা সেদিন পরীক্ষা হবে। সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। আসার সময় জানলাম, আমি মিলিটারি ক্লার্ক হতে যাচ্ছি। বেতন প্রথমে সর্বমোট তিয়াত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ফুডিং ক্লদিং, লজিং মেডিকেল ইত্যাদি ফ্রি।

মনের মধ্যে সর্বদাই আন্দোলন করতে লাগল। এবার যাত্রা আমার ভিন্ন পথে। ভিন্ন জগতে। বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

৭. ১২. ১৯৬২ ॥

আগামী পরশুদিন, আমার সেই শুভদিন যেদিন বহুদূর অজানার উদ্দেশ্যে কর্মের নিবিড়হাতছানিতে আমার অনিবার্য যাত্রা শুরু হবে। মনের মধ্যে কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠে। যতই ভাবছি, দেশ-মাতৃকার মঙ্গল-পূজায় উৎসর্গীকৃত আমি একজন তুচ্ছ প্রাণী। জীবন-মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য— ততই বাংলার জলবায়ুতে গড়া এই দেহ-মন প্রাণ কেমন একটু উতলা হয়ে উঠছে। একটা দৃঢ় আকর্ষণ আমার মর্মস্থলটাকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিতে চায়। কিন্তু বলাই বাহুল্য আমার মন ঐ আক্রমণ প্রতিরোধে লৌহ-কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সক্ষম। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ আমার এই মানসিক সুদৃঢ় প্রস্তুতিতে খুবই তুচ্ছ।

জিনিসপত্রগুলি খুঁটিনাটি যা প্রয়োজন গুছিয়ে ছিলাম। দেখা-সাক্ষাৎও কারও কারও সঙ্গে হয়ে গিয়েছে। তবে দেখা হল না কেবল একজনের সঙ্গে। যাবার বেলায় তার মলিন-মধুর মুখখানি বার বার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সে যে দেখা করার মতো আর কোনো পথই খোলা রাখেনি। চুপি চুপি জানতে চাইলে সে হয়তো বলত, তুমি মুক্ত, আমি বদ্ধ—এত বৈপরীত্য, মিলনের যে কোনো উপায়-ই নেই! এক রাশ বেদনা-মাখা মুখ তার আমি দেখতে পেতাম। নীরবতা ভেঙে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। সংসারটা তো এমনই; পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ কখনও মেলে না। আমাদেরও না-মেলাই স্বাভাবিক। তবুও মন-না-মানা একটুখানি দেখা; ছোট্ট করে বলা, আমি চলে যাচ্ছি, দূরে, বহুদূরে।

৯. ১২. ১৯৬২ ॥

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। অজানার পথে যাত্রা আমার শুরু হয়ে গেছে। রানাঘাট প্ল্যাটফর্মে বসে গত দিনকার কথা লিখছি। এখন ভোর ৫টা ৪৫ মিনিট। খুব কর্মব্যস্ত ছিলাম গতকাল।

'একটু আমার কথা শুনবেন?' মুখ তুলেই দেখি স্যুট-প্যান্ট পরা একজন ভদ্রলোক আমাকেই কিছু বলছেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তার বক্তব্য শুনে এমন মনে হল, ভদ্রলোক বড়ই বিব্রত। দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মীয় পরিজনদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। টাকা-পয়সা সবই তাদের কাছে ছিল। কলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত কোনো প্রকারে চলে গেছে; কিন্তু এখন তিনি কপর্দকহীন। ইংরেজি ভাষাটা তার খুব রপ্ত। ইংরাজিতেই আমার কাছে মাত্র চার আনা পয়সা চাইলেন। খুচরো পয়সা ছিল না। টাকা ভাঙিয়ে চার আনা পয়সা তাকে দিলাম। খুব কৃতজ্ঞতা জানালেন আমার প্রতি। সারাক্ষণ গল্প হল। বাড়ি তার নবদ্বীপে। কোলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করেন। কী কাজ করেন বলেননি। তবে বুঝলাম ক্ল্যারিক্যাল লাইনেই তার কাজ। এখন যাবেন কৃষ্ণনগর। পয়সা দেওয়া ছাড়া তাকে চা-বিস্কুট খাওয়ালাম। আমি নিজেও খেলাম। ৭টা ৩২

মিনিটে ট্রেন; এক সঙ্গেই কৃষ্ণনগর এসেছি। তিনি নিজের হাতে আমার ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় তার ঠিকানা লিখে দিলেন এবং বার বার আমায় পত্র দিতে বলছেন। যতক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ইংরেজিতেই তিনি কথা বলেছেন। পথে পরিচয়, পথে কথা, অসম-বয়সি এই দু'জনের পথেরই অজানার কোন্ শেষ প্রান্তে মিলিয়ে যাওয়া। কিছুক্ষণ থাকবে তার রেশ, তারপরেই যে যার মতো বেমালুম ভুলে যাওয়া। সমুদ্রের বুদবুদ রাশি আর কী! ঢেউ উঠল, নামল, তীরে আছড়ে পড়ল, মিলিয়ে গেল।

১০. ১২. ১৯৬২ ॥

'তোমার তো সায়েন্স গ্রুপে ভালো নম্বর আছে। তুমি ক্যারিকেলে যেতে চাও কেন?' বহরমপুরে রিক্রুটিং অফিসে আমার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মার্কশীটের নম্বর দেখে আর্মির অফিসার আমায় প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে আমি জানতে চেয়েছিলাম কী তাহলে আমি নেব?' তিনি বললেন, তুমি ওয়ার্কসপ ট্রেড নাও। এতে রেডিও মেকানিক, টেলি মেকানিক ও লাইন মেকানিক ট্রেড আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি রেডিও মেকানিকের ট্রেড্ই চাই।' আর্মি অফিসার লিখে দিলেন। ট্রেড—ওয়ার্কশপ গ্রুপ। এই কয়টি কথায় কেবল ট্রেড্-ই পরিবর্তন হল না, পরিবর্তন হয়ে গেল আমার অনেক কিছু। এ. এস. সি. (আর্মি সাপ্লাই কোর) বদলে হয়ে গেল সিগন্যাল কোর, ব্যাঙ্গালোরের জায়গায় হল মধ্যপ্রদেশ জবলপুর। রেলওয়ে পাশ ও এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেতে পেতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। গতকাল আধঘণ্টা লেটে আসা ট্রেনে বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় বহরমপুর স্টেশন থেকে রওনা হয়েছি। নৈহাটি পৌছোই রাত প্রায় এগারোটা। সঙ্গে সঙ্গেই গয়া প্যাসেঞ্জার ধরে বর্ধমান নেমেছি রাত দেড়টায়। ওয়েটিং রুমে জেগে-ঘুমিয়ে রাত-টা কাটিয়ে সকাল ৬টা ৩২ মিনিটের রাঁচি প্যাসেঞ্জার ধরে আসানসোল পৌঁছেছি আজ সকাল নয়টায়। সঙ্গে এখানকার কর্মরত দুইজন সমবয়সি যাত্রী বন্ধু পেয়েছিলাম। এখানে আসার পর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মনোরঞ্জন আমার অতীতের কর্ম-জীবনের বন্ধু। এখানকার পশুপতি গড়াই মেসে থাকত; পূর্বে চিঠির যোগাযোগ ছিল। প্রায় মাস দুয়েক আর চিঠির আদান-প্রদান হয়নি। যদিও সামান্য একটু ঠিকানার অদলবদল সে করেছে, তবুও তাকে খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। তার বর্তমান ঠিকানাটা এই রকম: এম্.আর. সরকার। প্রযত্নে এ.ভি. রাও। নীলগিরি আদর্শ মেস। ইসমাইল কোরাপাড়া। এস. বি. গড়াই রোড। পোঃ আসানসোল জিলা-বর্ধমান। এখন এই ঠিকানাতেই আছি। স্নান খাওয়া-দাওয়া করে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে গতকালের পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করে পুনঃ যাত্রার কথা ভাবতে লাগলাম। রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে বোম্বাই মেল ধরব।

১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে বোম্বাই মেলে মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর স্টেশনে এনে ফেলেছি। বহরমপুরের রিক্রুটিং অফিস থেকে আমায় বলে দেওয়া হয়েছিল স্টেশনেই আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মিলিটারি গাড়ি থাকবে। জিজ্ঞাসা করে ক্যাম্পের লোক পেলাম। তারা আমায় যেখানে এনে বসাল সেখানে আরও ১২ জন আমারই মতো ছেলে ছিল। পশ্চিম বঙ্গের কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি। মানে, সবাই অন্যান্য প্রদেশের। যাই হোক, আর্মির একটি খোলা গাড়িতে চড়ে বোধ করি মাইল দেড় দুই পেরিয়ে এসে থেমেছি। রাস্তার পাশেই একটা অফিস-ঘর। সেখানে সবাই আমরা Radhuri Cirtificate জমা দিয়েছি। রিক্রুটিং অফিস থেকে এই সার্টিফিকেট আমাদের দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটা ব্যারাক পেরিয়ে একেবারে উত্তরের শেষ সীমানার ব্যারাকটিতে আমাদের স্থান হল। রাতে রুটি, ডাল, সবজি খেলাম। আর্মির প্রথম খাবার পেটে পড়ল। ক্ষুধার্ত ছিলাম। তাই পরম তৃপ্তি সহকারে খেয়েছি। একটি কম্বল দেওয়া হল। নিদারুণ শীতে ব্যারাকের মেঝেয় শুয়ে একটি কম্বল গায়ে দিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম।

১২ তারিখের আর্মি-জীবনের প্রথম প্রভাত—ভারী বুটের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। সিনিয়র সেকসন, ওস্তাদের কশানে অতগুলি জোয়ানের একটি বুটের মতো পতনের আওয়াজে হয়তো রাস্তাতেই থামল। আর একটি কশানে তারা চলতে লাগল। পদধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময়ে মিলিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান আর্মির 'মিলিটারি ট্রেনিং' চলছে এখানে। মন একটা অদ্ভুত অনুভুতিতে ভরে উঠল। ভাবতে লাগলাম, আমিও হতে যাচ্ছি এর অংশীদার। চুল-কাটানো, স্নান, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম—সবই হয়েছে। চল্লিশ জন না হওয়া পর্যন্ত E/12 সেকসান তৈরি হবে না। এ পর্যন্ত সকালে আমরা ২৯ জন হয়েছি। দুপুরে একটা তাঁবুতে রাত্রে একটা ব্যারাকে চার-পাই সমেত স্থান পেয়েছি।

১৬. ১২. ১৯৬২ ॥

মোটেই অবসর নেই। কাজও যে কী হচ্ছে তা হুবহু লেখা যায় না। এখন এ কাজ তো তখন সে কাজ, টুকটাক কাজ লেগেই আছে। খাতা নিয়ে বসা প্রায় অসম্ভব। বসলেই ডাক আসবে কোনো কাজ করতে কিংবা কোথায়ও যেতে। সর্বদাই সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হয়। এখন ভোর ৪টা ৩০ মিনিট। বিছানা গুছিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসেছি ঘরের মাঝখানে যেখানে ইলেকট্রিকের একটি বালব্ জ্বলছে।

৪০ জন আমরা এই ব্যারাকে আছি। বাঙালি আমরা চারজন। আর বাকি সব মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে, কেরালা, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের ছেলে। এদের পঁচিশের উপরে কারই বয়স নয়। ভাষা কারও বোঝার যো নেই। তবে সাধারণভাবে হিন্দি এবং ইংরাজি চলনসই। অনেকেই হিন্দি বলতে পারে। আমরা যে